জীবনী-বিচিত্রা

যাঁদের কর্মে ও জ্ঞানে মানুষ বড়ো হয়েছে, তাঁদের জীবন ও সাধনার কথা।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

[illegible]

১১বি, চৌরঙ্গি টেরাস, কলিকাতা-২০

প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৫৫

প্রকাশক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বাক্ষর লিমিটেড, ১১বি চৌরঙ্গি টেরাস, কলকাতা ২০ ॥ মুদ্রাকর নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপ্না প্রেস লিমিটেড, ৮/১ লালবাজার স্ট্রীট, কলকাতা ১ ॥ বাঁধাই : ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্‌, ১০০ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৯ ॥

দাম : এক টাকা

প্রচ্ছদপট : খালেদ চৌধুরী



রামমোহন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

জীবনী-বিচিত্রার চতুর্থ বই



এক

ও কার প্রাসাদ ?

দালাই লামার।

কে তিনি ?

যাকে জিজ্ঞেস করা হল, এইবারে তার চোখ ছানাবড়া! দালাই লামা কে, জানো না ? তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তিনিই স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের দেবতা। তাঁর ইচ্ছেয় চন্দ্র-সূর্য ওঠে—অস্ত যায়। তাঁর আদেশে পাহাড়ে তুষার-ঝড় ওঠে—ভূমিকম্প হয়—মহামারী আসে। তাঁর ইচ্ছেয়—

আর বলতে হল না। সতেরো বছরের বিদেশী ছেলেটি খিল-খিল করে হেসে উঠল।

চারদিক থেকে একদল রক্ত-চোখ ঘিরে এল তাকে।

হাসলে যে ?

আমি এ-সব বিশ্বাস করি না। দালাই লামা একজন মানুষ—শুধুই মানুষ। ও-সব কিছুই তার করবার ক্ষমতা নেই। শুধু তোমাদের বোকা বানিয়ে, দেবতা সেজে আরামে দিন কাটাচ্ছে সে।

কে—কে বলে এত বড়ো পাপ কথা? দালাই লামার নামে এমন অপবাদ কে দিতে পারে, কোন সাহসে? চারদিকের রক্ত-চোখগুলোতে দপ-দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। এই অবিশ্বাসী বিদেশীকে তারা হত্যা করবে।

হত্যা তারা করতও। কিন্তু তিব্বতের মেয়েরাও মায়ের জাত। তারাই ছেলেটিকে আড়াল করে রাখল স্নেহ দিয়ে, তারাই তার প্রাণ বাঁচাল।

তুষারঢাকা হিমালয়ের তুর্গম-তুস্তর পথ। প্রতি পদে পদে মৃত্যু যেন ফাঁদ পেতে রেখেছে। মেঘ আর কুয়াশার ভেতর দিয়ে, চোরা-বরফের গহ্বর বাঁচিয়ে, শ্যাওলায়-পিছল পাথরে সাবধানে পা ফেলে ফেলে সমতলের দিকে ফিরতে ফিরতে শুধু একটি কথাই ভাবতে লাগল সেই তুঃসাহসী বিদেশী ছেলেটি।

ধর্মের নামে মানুষের এই মূঢ়তাকে সে দূর করে দেবে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সুদূর তিব্বতেও নয়—সারা পৃথিবীর কাছে সে প্রচার করবে যুক্তি আর মুক্তির বাণী। মেরুদণ্ডহীন ভীরুদের সে জাগিয়ে তুলবে কঠিন আত্মশক্তিতে।

আর, সে কখনো ভুলবে না মায়ের জাতকে। তাদের তুঃখ মোচন করাও হবে তার সারা জীবনের সাধনা। তুর্ভাগা বাংলাদেশের তুখিনী মায়েদের জলভরা চোখ ছল-ছল করে উঠল তার দৃষ্টির সামনে।



দুই

প্রায় দুশো বছর আগে, ১৭৭৪ সালে।

হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে রায় রায়ান রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্রের যেদিন জন্ম হল—সেদিন বাড়িতে আনন্দের আর সীমা ছিল না। আদর করে ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটির নাম রাখা হয়েছিল রামমোহন।

জমজমাট সংসার। বহুকালের বনেদী জমিদার-বংশ—ঐশ্বর্য, খ্যাতি আর প্রতাপের তুলনা নেই। পরম বৈষ্ণব আর ভক্ত পরিবার—বাড়িতে রাজরাজেশ্বরের বিগ্রহ, দুবেলা ঘটা করে সে-বিগ্রহের পুজো হয়।

এমন পরিবারে জন্ম নিয়ে রামমোহনের যে এ-হেন মতিগতি হবে কে বুঝতে পেরেছিল সে-কথা?

একেবারে ছেলেবেলা থেকেই আশ্চর্য মেধাবী রামমোহন। অক্ষর-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পুঁথির দিকে ঝোঁক। রামকান্ত ভাবলেন, এই ছেলেটিকে মানুষের মতো মানুষ করে তুলতে হবে—লেখাপড়া শেখাতে হবে ভালো করে।

পলাশীর যুদ্ধের পর দেশে ইংরেজ সবেমাত্র জাঁকিয়ে বসেছে

তখন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট নয়—ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। তাদের কাজ ভারতবর্ষের নতুন জমিদারি থেকে খাজনা আদায় করা আর ব্যবসা করা।

দেশের শিক্ষা-দীক্ষা সবই তখন চলছে পুরোনো রীতিতে। সেই নবাবী আমলে যেমন চলত। অবস্থাপন্ন হিন্দু পরিবারের ছেলেরা তখন সংস্কৃত আর ফার্সী শিখলেই উচ্চশিক্ষিত বলে গণ্য করা হত তাঁদের।

রামকান্ত ছেলেকে সংস্কৃত শিখতে পাঠালেন কাশীতে। কয়েক বছরের মধ্যেই সংস্কৃতে অদ্ভুত পণ্ডিত হয়ে উঠলেন রামমোহন। তারপর তাঁকে ফার্সী শেখাবার জন্যে পাটনায় পাঠালেন রামকান্ত। এত ভালো ফার্সী শিখলেন যে তাঁর নাম হল "মৌলভী রামমোহন"।

চোদ্দ-পনেরো বছর বয়েসেই অসামান্য পণ্ডিত হয়ে রামমোহন রাধানগরে ফিরে এলেন। শিক্ষার যে-টুকু বাকি ছিল তা সম্পূর্ণ হল পালপাড়া গ্রামের বিখ্যাত অধ্যাপক নন্দকুমার কাব্যালঙ্কারের সংস্পর্শে এসে। পরে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নামে এই নন্দকুমার বিখ্যাত হয়েছিলেন।

কিন্তু এত বিদ্যা, এত জ্ঞান বুঝি কাল হল রামমোহনের পক্ষে। অন্তত রামকান্ত সেই কথাই ভাবলেন।

দেবদেবীর পুজোয় রামমোহনের আর বিশ্বাস নেই। তাঁর মতে ঈশ্বর এক-অদ্বিতীয়! মাটি-পাথরের দেবতাকে পুজো করা মিথ্যে বিড়ম্বনা। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক আর ক্রীশ্চানই হোক—এক ঈশ্বরকে যারা নানারূপে দেখে, তারা ভ্রান্ত!

প্রথম-প্রথম রামকান্ত ছেলেকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুদিনেই বুঝতে পারলেন তাঁর ছেলে দুর্ধর্ষ তার্কিক। তর্কে-বিচারে ছেলের সামনে তিনি দাঁড়াতেও পারেন না!

রামকান্তের ধৈর্যচ্যুতি হল। গর্জন করে বললেন, বিধর্মী, নাস্তিক, কুলাঙ্গার! বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে!

পনেরো বছরের ছেলে সেই মুহূর্তেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

কোথায় গেল?

ভারতবর্ষকে দেখতে। সত্যের সন্ধান করতে।

দেখল ভারতবর্ষকে। কী শোচনীয় কুসংস্কার—কী মূঢ়তা! এক-একজন কুলীন তিনশো চারশো করে বিয়ে করে; একটি কুলীন যখন মারা যায়—তখন ছমাসের মেয়ে থেকে ছিয়াশী বছরের বুড়ী পর্যন্ত একসঙ্গে বিধবা হয়।

দেখতে পেল সতীদাহের বীভৎস ভয়ঙ্কর রূপ। নব্বুই বছরের বুড়ো স্বামীর চিতায় ষোলো বছরের স্ত্রীকে জোর করে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, ধূপ ধুনোর গন্ধ ছড়িয়ে আর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে প্রচার করা হচ্ছে—সতী স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে স্বামীর চিতায় সহমরণে গেলেন!

একটা চমৎকার ঘটনা বলি শোনো।

দিল্লীর এক শেঠজী স্বর্গে গেছেন। শেঠজী কোটিপতি ঘরে তাঁর চার-চারটি স্ত্রী, দলে দলে খিদমদ্‌গার, ছ কোবর্দার।

যমুনার ধারে কয়েকশো মণ চন্দন কাঠ দিয়ে তৈরি হল আকাশ ছোঁয়া চিতা। চিতায় শেঠজীর সঙ্গে উঠলেন তাঁর চারটি স্ত্রী।

কিন্তু অমন মানী লোকের স্বর্গে গিয়ে চারটি স্ত্রীতেই কেবল কুলোবে কেন? অতএব কয়েকজন ঝি-চাকরকেও স্বর্গে যেতে হল তাঁর সঙ্গে। তামাক সাজবে কে—পা টিপে দেবে কে—হাওয়া করবে কে?

সেইখানেই শেষ নয়। দুটো প্রকাণ্ড আরবী ঘোড়াকেও চিতায় চড়িয়ে দেওয়া হল।

আবার ঘোড়া কেন? বা-রে, নইলে শেঠজীর মতো অমন দিক্‌পাল লোক কিসে চড়ে স্বর্গের দেউড়িতে ঢুকবেন? স্বর্গের দারোয়ানেরাই বা নইলে দুহাত তুলে তাঁকে সেলাম ঠুকবে কিসের খাতিরে?

এমনিই ছিল সে-যুগের কুসংস্কার। আজ আমাদের হাসি পায়—কিন্তু সেদিন রামমোহনের চোখ ফেটে জল এসেছিল। দুঃখে, লজ্জায়, ক্ষোভে।

দেখবার আরো অনেক বাকি ছিল। হিন্দুর দেশ ভারতবর্ষ —কিন্তু হিন্দু কোথায়? কেউ শাক্ত, কেউ বৈষ্ণব, কেউ রামায়েৎ, কেউ গাণপৎ। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ আর ঘৃণা। সারা ভারতবর্ষে কোটি কোটি হিন্দু আছে, কিন্তু কে সেই হিন্দু কেউ সে-কথা জানে না।

গঙ্গাসাগরে সন্তানকে ভাসিয়ে দিয়ে দেশের মানুষ ভাবে তার পুণ্যের ভাঁড়ার ভরে উঠল। ঘরের মেয়েদের অশিক্ষায় আর দুর্গতির মধ্যে ফেলে রেখে তারা মনে করে ধর্মচর্চা হচ্ছে! রাশি রাশি অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে থেকে তারা চিৎকার করে শাস্ত্রের বুলি আওড়ায়! বাংলাদেশ থেকে শুরু করে

দূরান্তের তিব্বত পর্যন্ত এক দুর্গতি আর একই মূঢ়তার ইতিহাস !

অসহ্য !

এই ইতিহাস বদলাতে হবে। এই অজ্ঞানতার পাপকে মুছে দিতে হবে চিরকালের জন্যে। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-ক্রীশ্চানকে একমন্ত্রে মিলিয়ে দিয়ে সারা ভারতবর্ষে একটি মহাজাতিকে গড়ে তুলতে হবে। আর সেই মিলন-মন্ত্র আসবে এই দেশের 'উপনিষদ্' থেকেই। সংস্কারের অজ্ঞতায় আমরা যা হারিয়েছি, তার পুনরুদ্ধার করবেন তিনি।

সেই সংকল্প বুকে নিয়েই চার বছর পরে রামমোহন রায় দেশে ফিরলেন।



তিন

কিন্তু দেশে ফিরেও রামমোহন বেশিদিন নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না।

পরম বৈষ্ণব রামকান্তের সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকদিনই তাঁর বিরোধ বাধে। সংসারের এই অশান্তির ভেতরে রামমোহনের মন ক্লান্ত হয়ে উঠল। কিছুদিন পৈতৃক-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের পর আবার একদিন তিনি বেরিয়ে পড়লেন পৃথিবীর পথে। নিজের ভাগ্য গড়ে তুলবেন নিজের হাতেই।

কিছুকাল পশ্চিমের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন। পাটনা ছাড়িয়ে—কাশী ছাড়িয়ে—আরো দূরে, আরো অনেক দূরে। এই ভ্রমণ তাঁর নিষ্ফল হল না। আরো ভালো করে ভারতবর্ষকে দেখলেন, আরো বিচিত্র অভিজ্ঞতায় চিন্তার ভাণ্ডার ভরে উঠল তাঁর।

যেখানেই যান—একই দুর্ভাগ্য, একই কুসংস্কার, একই অন্ধতা। রামমোহনের সংকল্প বজ্রের মতো কঠিন হতে থাকে। এই ভারতবর্ষকে তাঁর বদলাতে হবে—নতুন করে গড়ে দিতে হবে এ-দেশের অভিশপ্ত মানুষগুলোকে!

এ তো গেল চিন্তার দিক। কিন্তু কর্মবীর রামমোহন কাজের দিক থেকেও বসে ছিলেন না। নিজের বুদ্ধি আর উত্তমের সাহায্যে যথেষ্ট অর্থও উপার্জন করছিলেন তিনি।

ছু বছর পরে রামমোহন কলকাতায় এলেন ১৮০১ সালে। এখানেই শুরু করলেন কোম্পানির কাগজের ব্যবসা। কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালত আর নতুন-গড়ে-ওঠা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। এই সময় ইংরেজ সিভিলিয়ানদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়— এঁদের একজনের নাম জন ডিগ্‌বি। ডিগ্‌বির সঙ্গে পরিচয় রামমোহনের জীবনের একটা মস্ত বড়ো ব্যাপার। কেন, সে-কথা পরে বলছি।

রামমোহনের বাবা রামকান্ত রায় তখন বর্ধমান রাজসরকারে চাকরি করতেন এবং সেখানেই বাড়ি করে থাকতেন। বেহিসেবী রামকান্ত রায় শেষ জীবনে নানা রকম দেনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। অসুখে এবং মানসিক দুশ্চিন্তায় বর্ধমানে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়।

রায় রায়ানদের আদি বাড়ি লাঙ্গুলপাড়ায় রামকান্তের শ্রাদ্ধের আয়োজন হল। বাপের শ্রাদ্ধের জন্যে রামমোহনকেও আসতে হল দেশে।

কিন্তু রামমোহনের নতুন ধর্মমত নিয়ে গোলযোগ বাধল। রামমোহনের মা তারিণী দেবী তাঁর নাস্তিক ছেলেকে পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকার দিলেন না।

এতদিন সামান্য বন্ধন ছিল, এবার তা-ও কাটল। একদিকে মায়ের অভিশাপ—অন্যদিকে নিজের সত্য। এই দুটিকে মাথায়

নিয়ে রামমোহন চিরদিনের মতোই নিজের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

জন ডিগ্‌বির সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল। এর মধ্যে টমাস্ উড্‌ফোর্ড নামে একজন ইংরেজ কালেক্টারের দেওয়ানি করে সরকারী কাজে রামমোহন কিছু অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন। এই সব কারণে ডিগ্‌বি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে রামমোহনকে নিজের দেওয়ান করে নিলেন। রামমোহন ডিগ্‌বির সঙ্গে রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর —এই সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

কিন্তু ডিগ্‌বির সঙ্গে রামমোহনের কেবল মনিব-কর্মচারীরই সম্বন্ধ ছিল না। এই ইংরেজ সিভিলিয়ানটি রামমোহনের অসামান্য প্রতিভা বুঝতে পেরেছিলেন। সে-কালে কোনো ইংরেজ অফিসারের শাসনে কোনো কালা-আদমির চেয়ারে বসবার অধিকার ছিল না। ডিগ্‌বি রামমোহনকে সে-অধিকার দিয়েছিলেন।

একদিন কথায় কথায় ডিগ্‌বি বললেন, রামমোহন, তোমার ফার্সী আর সংস্কৃতে এত দখল—এমন অসাধারণ পণ্ডিত তুমি! কেন তুমি ইংরেজি শেখো না? কেন তুমি শেকস্‌পীয়র আর ফ্রান্‌সিস্ বেকনের আশ্চর্য ভাবা থেকে বঞ্চিত রয়েছ?

এ-যুগের দুনিয়াকে জানতে গেলে ইংরেজি না শিখলে চলবে না এ-কথা রামমোহন জানতেন। কিন্তু কে তাঁকে ইংরেজি শেখাবে? দেশে তখন ইংরেজি শেখার স্কুল নেই—শেখার রেওয়াজও নেই। ফার্সী জানলেই সরকারী চাকরি করা যায়। কে ইংরেজি শেখাবে?

ডিগ্‌বি বললেন, বেশ তো, আমিই শেখাব।

রামমোহন তৎক্ষণাৎ রাজী।

ছাত্রের মতো ছাত্র পেলেন ডিগ্‌বি। ক্ষুরধার মেধা, অসামান্য নিষ্ঠা। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে রামমোহন যে-কোনো ইংরেজের মতোই চমৎকার ভালো ইংরেজি বলতে আর লিখতে শিখলেন। ডিগ্‌বি তাঁর জর্‌নালে এ-সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠে রামমোহনের প্রশংসা করে গেছেন। আর রামমোহন তাঁর অসংখ্য ইংরেজি লেখায় এই অসামান্য কৃতিত্বের প্রমাণ স্থায়ী করে রেখেছেন।

এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। সেই ঘটনায় রামমোহনের চরিত্র আর ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে।

জন ডিগ্‌বি ভাগলপুরে বদলি হয়েছেন, সঙ্গে রামমোহনকেও যেতে হয়েছে। ভাগলপুরে তখন যিনি বিদায়ী কালেক্টার তাঁর নাম স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিল্‌টন। জবরদস্ত, বদ্‌মেজাজী, নেটিভ্‌-বিদ্বেষী লোক ছিলেন এই হ্যামিল্‌টন সাহেব। সেদিন রামমোহন পালকি চেপে চলেছেন ভাগলপুরের পথ দিয়ে। রাস্তার ধারে একটা ইঁটের পাঁজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন হ্যামিল্‌টন। তাঁকে সেলাম না করেই একজন কালো-আদমি পালকি চড়ে চলে গেল—এই দেখে হ্যামিল্‌টনের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। যে-যুগে সাহেবদের সামনে দিয়ে মাথার ছাতা খুলে যাওয়ার দস্তুর ছিল না, সে-যুগে এত বড়ো গোস্তাকি!

রাগে আগুন হয়ে হ্যামিল্‌টন ঘোড়া ছুটিয়ে রামমোহনের পালকি ধরলেন। তারপর শুরু হল অকথ্য-অভব্য গালাগালি।

রামমোহন ভদ্রভাষায় বোঝাতে চাইলেন যে হ্যামিল্‌টনকে তিনি দেখতে পাননি। কিন্তু ভদ্রভাষা শোনবার মতো ভদ্রতাও হ্যামিল্‌টনের ছিল না। শেষ পর্যন্ত রামমোহন তাঁর গালাগালিতে কর্ণপাত না করেই পালকি চেপে চলে গেলেন।

কিন্তু তাই বলে এ-অপমান মুখ বুজে সইবেন এমন মানুষ রামমোহন নন। তৎক্ষণাৎ তিনি তখনকার বড়লাট লর্ড মিণ্টোর কাছে এই অসম্মানের প্রতীকার দাবি করে একখানি বিস্তৃত আবেদনপত্র পাঠালেন।

সে-আবেদন ব্যর্থ হয়নি। এর ফলে স্যার হ্যামিল্‌টনের কাছে নির্দেশ এল, ভবিষ্যতে কোনো দেশীয় লোকের সঙ্গে যেন তিনি কোনোরকম অভদ্র বচসা না করেন।

এমনি বাঘের মতো মানুষ ছিলেন রামমোহন।



চার

ডিগ্‌বির সঙ্গে চাকরি করে রামমোহনের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হয়েছিল। রংপুর থেকে তিনি দেশে ফিরে এলেন।

এর আগে আরো একটু ঘটনা ঘটেছিল। সেটা এখানে বলে রাখি।

রামমোহনের দাদা জগমোহন রায়ের স্ত্রী ছিলেন অলকমণি দেবী। এই বৌদিকে রামমোহন অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন— মায়ের মতোই ভালোবাসতেন।

জগমোহন অকালে মারা গেলেন। আর তাঁর সঙ্গে সতী হলেন অলকমণি। জানা যায়, অলকমণি সতী হতে চাননি। কিন্তু ধর্মের নামে রাক্ষস সমাজ তাঁকে জোর করে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বীভৎসভাবে আর-একটি নারীকে হত্যা করা হয়।

রামমোহন নাকি বৌদিকে বাঁচাবার জন্যে ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি এসে পৌঁছুলেন, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। ঢাকের শব্দে, ধুনোর ধোঁয়ায় পৈশাচিক আনন্দে জনতা চিৎকার করছে : জয় সতী অলকমণির জয়!

বৌদির চিতার পাশে পাথরের মূর্তির মতো এসে দাঁড়ালেন রামমোহন। এক চোখে আগুন, আর এক চোখে জল নিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—জীবনের যে-কোনো মূল্যে ভারতবর্ষ থেকে নারীহত্যার এই পৈশাচিক প্রথা তিনি চিরদিনের মতো লোপ করে দেবেন !

ঘটনাটি সত্য কিনা এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তর্ক আছে। কিন্তু রামমোহনের একাধিক জীবনীকার এ-ঘটনার উল্লেখ করে গেছেন। সত্যি হওয়া অসম্ভব নয়। আর রামমোহনের প্রতিজ্ঞা ?

হ্যাঁ—সে-প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করেছিলেন বইকি। তাঁর কোনো সংকল্প কোনোদিনই ব্যর্থ হয়নি। সে-কথা পরে বলব।

রামমোহন ডিগ বির কাছ থেকে দেশে ফিরে এলেন। এসে, রঘুনাথপুরে একটি নতুন বাড়ি তৈরি করলেন।

কিন্তু তাঁর স্বাধীন মতামতের জন্যে তখন চারদিকেই তাঁর শত্রু। তাঁর নিজের মা তারিণী দেবী পর্যন্ত এই বিধর্মী সন্তানের মৃত্যু-কামনা করছেন। এই সুযোগে রামনগরের সমাজপতি রামজয় বটব্যাল বিষধর সাপের মতো ফণা তুলল।

রামমোহন নিজের বাড়িতে বসে শাস্ত্র আলোচনা করেন—বই লেখেন। সারা ভারতবর্ষের জন্য সর্বজনীন ধর্মমত তিনি গড়ে দেবেন—হিন্দু-বৌদ্ধ-ক্রীশ্চান-মুসলমান সকলকে এক করে দেবেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রে। এত বড় অনাচার সইবে কেন গোঁড়া সমাজপতি রামজয় বটব্যালের ?

নানা উৎপাত শুরু হল রামমোহনের বাড়িতে। রাতদিন ঢিল পড়ছে—পড়ছে গোরুর হাড়। তাঁর নামে কদর্য ভাষায়

গান রচনা করে দলে দলে তাই গেয়ে বেড়াচ্ছে বাড়ির আশেপাশে।

রামমোহন বুঝলেন, গ্রামে বসে নীরব সাধনা তাঁর নয়। তাঁকে একেবারে গোড়া থেকে কাজ শুরু করতে হবে। যেতে হবে বাংলাদেশের প্রাণতীর্থ কলকাতায়। সেখান থেকেই সংগ্রাম শুরু করবেন তিনি। শুরু করবেন তাঁর মহাভারতের সাধনা।

রামমোহন কলকাতায় এলেন।

কলকাতার একাধিক বাড়ি এর মধ্যেই কিনেছিলেন রামমোহন। মানিকতলাতেও একটি বাড়ি ছিল তাঁর। সেখানে এসেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রতিভাবান বিত্তশালী মানুষটির নাম কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে সম্ভ্রান্ত মানুষ আসতে লাগলেন তাঁর বাড়িতে। এমনকি যাঁরা বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে আসতেন, তাঁরাও রামমোহনকে ভারতবর্ষের অন্যতম দ্রষ্টব্য বলে মনে করতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আর্ল অব্ মান্‌স্টার, ফরাসী বিজ্ঞানী ভিক্তর জাকম, ইংরেজ মহিলা ফ্যানী পার্কস্ ইত্যাদি। বিখ্যাত লেখক জর্জ বার্নার্ড শ' নাকি একজন ভ্রমণকারীকে বলেছিলেন, 'তুমি ইংল্যাণ্ড দেখতে চাও? বার্নার্ড শ'কে যখনি দেখেছ, তখনি তোমার ইংল্যাণ্ড দেখা হয়ে গেছে!' রামমোহন সম্বন্ধেও বোধহয় এ-কথা সেদিন বলা যেতে পারত।

কলকাতায় এসেই রামমোহন তাঁর নতুন সর্বভারতীয় ধর্মমত প্রচারে অগ্রসর হলেন। তাঁর চারদিকে এসে ঘিরে দাঁড়াল অসংখ্য অনুরাগীর দল। এঁদের মধ্যে ছিলেন ছাত্রবন্ধু ভারত-প্রেমিক

ডেভিড্ হেয়ার, 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী, তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্রীশ্চান পাদরি অ্যাডাম, ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে। রামমোহনের নতুন ধর্মমতকে যাঁরা পছন্দ করতেন না, তাঁদেরও অনেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তাঁর কাছে আসতেন। তাঁদের ভেতরে ছিলেন রাজা গোপীমোহন ঠাকুর, পাইকপাড়ার জয়কৃষ্ণ সিংহ, বিখ্যাত পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ ইত্যাদি।

এঁদেরই কয়েকজনকে নিয়ে রামমোহন প্রথমে তাঁর মানিকতলার বাড়িতে, পরে সিমলার নতুন বাড়িতে (যে-বাড়ি এখন আমহার্স্ট স্ট্রীটে রয়েছে) একটি সভা স্থাপন করলেন। এই সভায় নানারকম আলোচনা হত—শাস্ত্র-পাঠ হত, রামমোহনের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (এক ঈশ্বর ছাড়া আর দ্বিতীয় নেই) নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক চলত। এ-সভায় জাতিভেদ ছিল না, সমাজ-ভেদ ছিল না। সকলের জন্যেই ছিল এর অবারিত দ্বার। দেশের সমস্ত মানুষের জন্যেই জ্ঞান আর বুদ্ধির দরজা খুলে দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু এই উদার ধর্মমত গোঁড়ারা বেশিদিন সহ্য করতে পারল না। ক্রমেই রামমোহনের বিরুদ্ধে নানা রকম আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। রামমোহনও ছাড়বার পাত্র নন। সত্য আর যুক্তির ভিত্তিতে একসঙ্গে হিন্দু, মুসলমান আর ক্রীশ্চানকে আক্রমণ করলেন তিনি।

হিন্দুরা রামমোহনের মুণ্ডপাত কামনা করতে লাগলেন। মুসলমানরা খেপে উঠলেন তাঁর ওপর। শ্রীরামপুরের ক্রীশ্চান মিশনারিদের সঙ্গে কাগজে-পত্রে রীতিমতো যুদ্ধ চলতে লাগল তাঁর। সপ্তরথী-ঘেরা অভিমন্যুর মতো বীরবিক্রমে সকলের সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন রামমোহন।

অভিমন্যু ব্যূহে প্রবেশ করতেই জানতেন—ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার পথ তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু রামমোহন অমিত প্রতাপে শত্রুবাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বেরিয়ে এলেন। বইয়ের পর বই লিখতে লাগলেন, প্রকাশ্য বিচারসভায় তাঁর কাছে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে লাগলেন দিক্‌পাল পণ্ডিতেরা। তাঁর ফার্সী বই 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদিন,' 'বেদান্ত-সার' 'বেদান্তগ্রন্থ' ইংরেজি 'ক্রীশ্চান-সমাজের প্রতি আবেদন'—চারদিকে যেন আগুন জ্বালিয়ে তুলল।

সারা ভারতবর্ষ চঞ্চল হয়ে উঠল—ইয়োরোপের ক্রীশ্চান সমাজে পর্যন্ত সাড়া পড়ল। এমনকি বন্ধু অ্যাডামকে নিয়ে একটি নতুন ধর্মসভা পর্যন্ত তিনি গড়ে তুললেন, তার নাম 'ইউনিটারিয়ান কমিটি', তার উদ্দেশ্য গোঁড়া ক্রীশ্চান-ধর্মের সংস্কার।

ক্রীশ্চান পাদ্রীরা সমস্বরে রামমোহন আর অ্যাডামকে গালা-গালি আরম্ভ করে দিলেন। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে রামমোহনের বই ছাপানো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু রামমোহন হার মানতে জানতেন না। নিজের টাকায় তিনি নতুন প্রেস কিনলেন—সেই প্রেস থেকে চলতে লাগল তাঁর অপরাজেয় অভিযান।



পাঁচ

এ সব তো গেল ধর্ম আর তত্ত্বের দিক। কিন্তু আরো অনেক কাজ বাকী। অনেক কাজ। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় কই রামমোহনের ?

দেশে তখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব। এই কোম্পানি ভারতবর্ষে শিক্ষা-প্রচারের কাজে কিছু কিছু অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ তখনো শিক্ষা বলতে ফার্সী আর সংস্কৃতের চর্চাই বুঝতেন।

রামমোহন অনুভব করলেন, ফার্সী আর সংস্কৃতের মধ্য দিয়ে এখন অতীতের তপস্যা করে লাভ নেই। যুগের হাওয়া বদল হয়ে গেছে, নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইয়োরোপই পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছে। এক সময়ে রাশিয়ার পিটার দি গ্রেট ইয়োরোপের দিকে জানালা খুলে দিয়ে রাশিয়ায় নতুন জীবনের সাড়া এনে দিয়েছিলেন। রামমোহন তাঁরই মতো অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন, তিনি চাইলেন, ইংরেজির মাধ্যমে দেশে নতুন চিন্তা-চেষ্টার বন্যা এসে আছড়ে পড়ুক। ইংরেজি-শিক্ষার সমর্থনে একবার লর্ড আমহার্স্টকে তিনি যে একটি সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন, তাতে

তার এই বলিষ্ঠ চিন্তা-শক্তি আর প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় মেলে।

এই সময় কলকাতায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এ-সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সক্রিয় উৎসাহ দেখান আর তাঁর সমর্থনে রামমোহন, ডেভিড্ হেয়ার, দ্বারকানাথ প্রভৃতিও এগিয়ে আসেন। শেষ পর্যন্ত ১৮১৬ সালের মে মাসে তখনকার সুপ্রীম কোর্টের চীফ্-জাস্টিস্ স্যার এডোয়ার্ড হাইড্ ঈস্টের বাড়িতে একটি আলোচনা-সভা বসল। কলেজ-সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা রচনার জন্যে কলকাতার সমস্ত বিশিষ্ট লোকের ডাক পড়ল—একদিকে যেমন রামমোহনের দলবল রইলেন, অন্যদিকে তাঁর বিরোধী পক্ষের রাধাকান্ত দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, মতিলাল শীল প্রভৃতিও উপস্থিত হলেন। রামমোহন নিজে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কিনা বলা যায় না।

চাঁদা তুলবার প্রস্তাব উঠল—সেই সঙ্গে কলেজের পরিচালক-সমিতি গড়বার প্রস্তাবও হল। আর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ এল রামমোহনের বিরোধী পক্ষ থেকে। রামমোহন যদি এই কলেজের ব্যাপারে কোনো অংশে জড়িত থাকেন, কিংবা কোনো চাঁদা দেন—তা হলে তাঁরা সমবেতভাবে এই প্রতিষ্ঠানকে বর্জন করবেন।

স্যার হাইড্ ইস্ট হতবাক। সে কি কথা! এ তো শিক্ষার ক্ষেত্র—এখানে এ-সব ব্যক্তিগত মতবাদের প্রশ্ন কেন?

কিন্তু রামমোহনের বিরোধী দল কোনো কথা শুনতে রাজী

নন। হিন্দু-ধর্ম-বিদ্বেষী রামমোহন এই কলেজের সংস্রবে থাকলে তাঁরা এর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখবেন না!

হাইড্ ইস্ট্ হাসলেন: আমি তো ক্রীশ্চান—দারুণ গোঁড়া ক্রীশ্চান। আমি যদি আপনাদের কলেজের জন্যে কিছু অর্থ-সাহায্য করি, সে কি নেবেন না আপনারা?

বিরোধী পক্ষ বললেন, নিশ্চয়ই নেব। কিন্তু রামমোহনকে কিছুতেই নেওয়া চলবে না। তাঁকে বাদ দিতেই হবে।

ইচ্ছে করলে রামমোহন নিজের জোরেই সেদিন কলেজের পরিচালন-সমিতিতে থাকতে পারতেন, তাঁকে ঠেকাবার শক্তি কারো ছিল না। কিন্তু শুধু তাঁর জন্যেই দেশের এমন হিতকর প্রতিষ্ঠানটি বিপন্ন হয়ে পড়বে! দলাদলির ফলে অঙ্কুরেই এ ক্ষতিগ্রস্ত হবে! এ হতে পারে না।

রামমোহন স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ালেন। যার জন্যে এত করেছেন—এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম ব্যয় করেছেন যাকে সফল করে তুলতে—তার এতটুকু ক্ষতিও তাঁর সইবে না।

রামমোহনকে বাদ দিয়েই গড়ে উঠল তাঁর স্বপ্নতীর্থ "বিদ্যালয়—মহাপাঠশালা।" সে-মহাপাঠশালা আজো বেঁচে আছে সগৌরবে। তার নাম এখন 'প্রেসিডেন্সি কলেজ।'

মহাপাঠশালা থাক—রামমোহন নিজেই একটি নতুন স্কুল গড়লেন। ইংরেজি শিক্ষা চাই—দেশে দেশে জ্ঞানের বিস্তার চাই—নতুন যুগের আলোয় জাতিকে জাগিয়ে তোলা চাই। নিজের হাতে তৈরি করলেন তাঁর 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল'।

ছাত্র আসতে চায় না। না-ই এল। ছেলে রমাপ্রসাদকে

ভর্তি করে দিলেন, শিষ্য নন্দকিশোর বসুর ছেলে রাজনারায়ণকে নিয়ে এলেন, দ্বারকানাথ ভর্তি করে দিলেন তাঁর ছেলে দেবেন্দ্রনাথকে। দু-চারজন করে আরো কিছু ছাত্র এল। এদের কাছেই রামমোহন শোনাতে লাগলেন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা—হিন্দু-মুসলমান-খ্রীশ্চান-বৌদ্ধের মিলনের বাণী।

কিন্তু আরো স্কুল চাই—আরো ব্যাপক ইংরেজি শিক্ষা চাই। তখন কলকাতায় চার্চ অব্ স্কট্ল্যাণ্ডের প্রধান বিশপ ছিলেন রেভারেণ্ড্ জেম্স্ ব্রাইস্। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে রামমোহন স্কটল্যাণ্ড্ থেকে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীকে আনালেন : তাঁর নাম আলেক্জাণ্ডার ডাফ্।

নতুন স্কুল খুলবেন ডাফ্। কিন্তু সাংঘাতিক সমস্যা দেখা দিল। স্কুল-বাড়ি আর পাওয়া যায় না। খ্রীশ্চানকে ঘর ভাড়া দেবে কে? জাত যাবে যে। তার ওপর ইংরেজি শিক্ষার ফলে ছেলেরা যদি খ্রীশ্চান হয়ে যায়—তখন?

ডাফ্ অকুল পাথারে পড়লেন। রামমোহন ভরসা দিয়ে বললেন, কুছ্ পরোয়া নেই। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

ডাফ্কে তিনি বাড়ি জোগাড় করে দিলেন। কিন্তু একটিও ছাত্র নেই—শুধু তো আর চেয়ার-বেঞ্চিকে পড়াতে পারেন না ডাফ্। রামমোহন ছুটলেন—পরিচিত-বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্র জুটিয়ে আনতে লাগলেন।

এবারেও ব্যর্থ হলেন না তিনি। তাঁর বজ্র-প্রতিজ্ঞা কখনোই ব্যর্থ হয়নি। ডাফের সেই স্কুলই আজকের স্কটিশ চার্চ কলেজ।



ছয়

কাজ—কত কাজ!

দেশে খবরের কাগজ নেই—অতএব জনমত প্রকাশের মুখ-পাত্র চাই। রামমোহন পত্রিকার পর পত্রিকা বের করে চললেন। 'সম্বাদ-কৌমুদী,' 'ব্রাহ্মণ-সেবধি,' ফার্সী 'মিরাৎ-উল্-আখবার'—আরো কত কী! এই সব কাগজে তিনি প্রচার করতে লাগলেন তাঁর নতুন সর্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম, করে চললেন শাস্ত্রের বিচার, এনে দিতে লাগলেন নতুন চিন্তা আর আদর্শ। মেয়েদের ওপর সমাজের যে অত্যাচার চিরদিন চলে আসছে, তার প্রতীকার দাবি করলেন, ন্যায় বিচারের জন্য চাইলেন জুরির প্রথা, চাইলেন আসামীর 'হেবিয়াস কর্পাসের' অধিকার, প্রজার ওপর জমিদারী পীড়নের অবসানের জন্যে নতুন প্রজাস্বত্ব আইন! সেই সঙ্গে বেরুতে লাগল বইয়ের পরে বই।

চারদিকে কি শত্রুর অভাব ছিল? মোটেই না। রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীরাও তাঁদের বইপত্রে, পত্রিকায় কদর্য কটু ভাষায় গালা-গাল করতে লাগলেন রামমোহনকে। রটে গেল তিনি ম্লেচ্ছ—তিনি গোরুর মাংস খান—আরো কত কী।

গালাগালির জবাব দিলেন না রামমোহন। ভদ্র সংযত ভাষায় তিনি নিজের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করে চললেন। তাঁর সেই দুর্ভেদ্য বর্মে ঘা লেগে প্রতিপক্ষের অস্ত্র টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল।

যুক্তিতে যারা হারল, রাগে অন্ধ হয়ে উঠল তারা। রামমোহন রাস্তায় বেরুলে তাঁর গাড়িতে ঢিল পড়ে। বাড়ির চারদিকে লোক জড়ো হয়ে চিৎকার করে অকথ্য ভাষায়। তাঁর নামে গান বেঁধে নগর-সংকীর্তন চলতে লাগল :

ব্যাটার সুরাই মেলের কুল,
ব্যাটার বাড়ি খানাকুল,
ব্যাটার জাত বোষ্টম কুল,
ওঁ তৎসৎ বলে ব্যাটা
বানিয়েছে ইস্কুল—'

কিন্তু সত্যের পথ ধরে যিনি চলেছেন, এ-সব ক্ষুদ্রতা তাঁর গায়ে লাগে না। পায়ের নিচে কাঁটা ছড়িয়ে থাকলেও ছুটন্ত তেজী ঘোড়া কি থেমে দাঁড়ায়?

রামমোহনও দাঁড়ালেন না। এগিয়ে চললেন।

অনেক বন্ধু শত্রু হল—ভয় পেয়ে সরে দাঁড়াল কতজন। কিন্তু 'একলা চলরে।' আজ দেশ যদি আমায় না চেনে, কাল চিনবে; আজকে পাগল বলে যে গায়ে ধুলো দিচ্ছে—কাল সে মালা নিয়ে আসবে পেছনে পেছনে। এই তো নিয়ম!

দূর থেকে যারা দিনরাত রামমোহনের সর্বনাশ কামনা করে, তারাও মনে মনে বলে: সাবাস! পুরুষ নয়—সিংহ!

কাছে আসতে সাহস নেই কারো। ভয় হয়, সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তারাও বুঝি রামমোহনের শিষ্য হয়ে দাঁড়াবে। দেশের সাধারণ মানুষ—যারা সমাজপতিদের ভয়ে রামমোহনের চৌহদ্দি মাড়ায় না, তাদের মনেও আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে রামমোহনের আশ্চর্য প্রভাব!

একটা ঘটনা বলি।

আদালতে সাক্ষীদের শপথ নিতে হয়। সে-কালে হিন্দুদের গঙ্গাজল নিয়ে শপথ করতে হত।

হঠাৎ একজন আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ করে বসল। জল চিরদিনই জল! গঙ্গারই হোক আর যারই হোক। সে-জল ছুঁয়ে শপথ করতে লোকটি কিছুতেই রাজী নয়।

রামমোহনকে হয়তো সে চোখেও দেখেনি। তবু আদালতে দাঁড়িয়ে সেই লোকটি ঘোষণা করল: আমি রামমোহনের শিষ্য। যাকে বিশ্বাস করি না, তার নাম নিয়ে শপথ করতে আমার বিবেকে বাধে।

সূর্যকে কয়েক টুকরো মেঘ কী করে রাখবে আড়াল দিয়ে? সমাজ আর সমাজপতিদের সমস্ত শাসনকে অগ্রাহ্য করে এই ভাবেই ছড়িয়ে পড়ছিল রামমোহনের ব্যক্তিত্বের প্রভাব।

তেজস্বী নির্ভীক মানুষ। অন্যায় দেখলেই রুখে দাঁড়ান। সে-শক্তি যত বড়োই হোক—লড়তে তাঁর বিন্দুমাত্র ভয় নেই। ভয় কাকে বলে তিনি জানতেন না।

দেশী খবরের কাগজে তখনকার দিনে যে স্বাধীন সাহসী সমালোচনা শুরু হয়েছিল, তা দেখে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির

ইংরেজ কর্তাদের চোখ টাটিয়ে উঠল। এই সব কাগজের মত-প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার জন্যে ১৮২৩ সালে এক আইন পাশ করা হল।

দেশের বড়ো বড়ো ধর্মধ্বজী, বড়ো বড়ো চাঁইয়েরা মাথা নিচু করে সে-অপমান হজম করে গেলেন। কেবল করলেন না রামমোহন। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে একমাত্র তিনিই তাঁর 'মিরাৎ-উল্ আখবার' বন্ধ করে দিলেন, জানালেন :

'আব্রু কে বা-সদ্ খুন ই বস্ত্ দিহদ্
বা-উমেদ্-ই করম্-এ, খাজা, বা-দায়বান
মা-ফরোশ্'—

অর্থাৎ, 'যে-সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর দামে কেনা হয়েছে, কোনো অনুগ্রহের আশায় তাকে দারোয়ানের কাছে বিক্রি কোরো না!' সে-যুগে এতবড়ো কথা কেবল রামমোহনেরই বলবার শক্তি ছিল।

শত্রু যেমন অসংখ্য—বাধা যেমন প্রচুর, তেমনি প্রলোভনেরও অন্ত ছিল না। তখন যে-সব মিশনারি ছিলেন, তাঁরা ভাবতেন, দেশের বড়ো বড়ো লোকদের ক্রীশ্চান করতে পারলেই বুঝি সারা দেশ ক্রীশ্চান হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়বে। চার্চ অব্ ইংল্যাণ্ডের আর্চবিশপ মিড্লটনেরও সেই বিশ্বাসই ছিল।

দেশের সেরা মানুষ রামমোহন রায়কে বশ করতে পারলেই কার্যসিদ্ধি সহজ হয়ে যায়। নানা কারণে মিড্লটনের আশা আরো দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। চলতি হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যাঁর মিল নেই—ক্রীশ্চানদের 'ইউনিটারিয়ান কমিটি'র সঙ্গে যাঁর এমন

ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—একটু চেষ্টা করলেই কি তাঁকে ক্রীশ্চান ধর্মে টেনে আনা যায় না ?

একদিন রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করে সেই ইঙ্গিতই দিলেন মিড্‌লটন। তুমি ক্রীশ্চান হও—দেখবে তোমার সৌভাগ্য কেমন করে খুলে যায় !

অর্থ, রাজসম্মান, প্রতিপত্তি—

ঘুস ? রামমোহনের ছুচোখে আগুন জ্বলে উঠল। সেই যে মিড্‌লটনের বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন—জীবনে আর তাঁর মুখদর্শনও করেননি তিনি।

যেখানে পীড়িতের কান্না—সেখানেই রামমোহন। যেখানে অন্যায়, সেখানেই বজ্রপাণি রামমোহন। স্বদেশেই হোক—আর বিদেশেই হোক। তিনি তো কেবল বাঙালীরই নন; সারা ভারতবর্ষের তিনি—সারা পৃথিবীর !

সাম্য-স্বাধীনতা আর ভ্রাতৃত্বের মন্ত্রে যে বিরাট ফরাসী-বিপ্লব ঘটে গেছে—রামমোহন দিনের পর দিন তার সংবাদের জন্যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করেন। জনগণের জয়ের সংবাদে আনন্দে আশায় তাঁর বুক ভরে ওঠে। তিনি স্বপ্ন দেখেন, কবে তাঁর দেশের মানুষও ফ্রান্সের বিপ্লবী জনতার মতো মুক্তকণ্ঠে গেয়ে উঠবে : 'মার্সেই।' কবে আমাদের দেশেও চূর্ণ হয়ে যাবে বাস্তিলের কারাগার !

মানুষের স্বাধীনতা আর মুক্তির জন্যে তাঁর যে কী অসামান্য ব্যাকুলতা ছিল, তার ছুটি উদাহরণ দিই।

তখন কলকাতায় একজন উদারচেতা ইংরেজ সাংবাদিক

ছিলেন, তাঁর নাম সিল্‌ক্ বাকিংহাম। এই বাকিংহামের সঙ্গে রামমোহনের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। ১৮২১ সালের আগস্ট মাসে বাকিংহাম এক ভোজসভার ব্যবস্থা করেন এবং যথারীতি রাম মোহন তাতে নিমন্ত্রিত হন।

কিন্তু সেদিনের সেই নিমন্ত্রণে রামমোহন যেতে পারেননি একটা শোচনীয় দুঃসংবাদে তিনি তখন আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন খবর এসেছিল, অস্ট্রিয়ার অন্যায় আক্রমণে ইটালির জনসাধারণ পরাধীনতার ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে।

এমন দুর্দিনে রামমোহন কি কখনো যোগ দিতে পারেন ভোজসভায়? সে-নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বাকিংহামকে যে-চিঠি তিনি লিখেছিলেন, মনুষ্যত্বের মহিমায়, স্বাধীন চেতনার দীপ্তিতে তা অমর হয়ে রয়েছে। রামমোহন লিখেছিলেন: "Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful !" অর্থাৎ "স্বাধীনতার শত্রু এবং অত্যাচারের বন্ধুরা কখনোই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারেনি—কখনো পারবেও না!"

এই ছিল রামমোহনের জীবনবেদ।

দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলোর ওপর তখন যা-খুশি অত্যাচার করত স্পেনের সরকার। ১৮২৩ সালে এই উপনিবেশ-গুলো সেই অত্যাচার থেকে যখন মুক্ত হল, তখন রামমোহন আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। শুধু তাই নয়, নিজের বাড়িতে এক বিরাট ভোজসভার ব্যবস্থা করে ঔপনিবেশিক জনগণকে অভিনন্দিত করেছিলেন তিনি।

এই সভায় তাঁর বহু ইয়োরোপীয় বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের একজন জিজ্ঞাসা করেন, দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা লাভে তাঁর এত আনন্দ কেন? তাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষ রামমোহনের সম্পর্কই বা কী?

উত্তরে উত্তেজিত ভাষায় রামমোহন বলেছিলেন: "What! Ought I to be insensible to my fellow creatures wherever they are, or however unconnected by interests, religion or language?"

"কী! স্বার্থ, ধর্ম বা ভাষার মিল না থাকলেই কি আমার সহমর্মীদের (স্বাধীনতার সংগ্রামীদের) সম্পর্কে আমি অচেতন হয়ে থাকব?"

এই বিশ্বপ্রেমের মন্ত্রই রামমোহনের কাছ থেকে পরে গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। পৃথিবীর সমস্ত উৎপীড়িত-শোষিত মানুষের বেদনাকে অনুভব করার দীক্ষা রামমোহনের কাছ থেকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। একবার রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁর জীবনের আদর্শ মানুষ কে? কবিগুরু অসংকোচে জবাব দিয়েছিলেন: রামমোহন রায়।

ঠিকই জবাব দিয়েছিলেন।



সাত

দেহে-মনে অদ্ভুতকর্মা পুরুষ রামমোহন রায়।

অটুট স্বাস্থ্য, অসামান্য কর্মশক্তি। দৈনিক আঠারো-উনিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে পারেন। খেতেও পারেন তেমনি। বারো সের করে দুধ আর চার সের করে মাংস খাওয়া তাঁর পক্ষে কিছুই নয়—পঞ্চাশটা ডাব নইলে তেষ্টা মেটে না—চল্লিশটা আম দিয়ে জলযোগ করেন। পুরুষের মতো পুরুষ সন্দেহ কী!

চমৎকার সুন্দর চেহারা। তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি—প্রতিভা-প্রসন্ন ললাট—যেন জনগণমন-অধিনায়ক হওয়ার ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছেন।

দশ হাতে কাজ করে চলেছেন। ব্রহ্মসভা, অ্যাংলো হিন্দু স্কুল, ডাফ স্কুল, ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে ভারতীয়দের অধিকার আদায় করবার আন্দোলন, দেশের শিল্পনৈতিক উন্নতি—যেদিকে তাকানো যায়, হিমালয়ের চুড়োর মতো রামমোহন দাঁড়িয়ে আছেন মাথা তুলে। দেশের সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তা-ধারার মূর্ত বিগ্রহ রামমোহন। একটি মাত্র মানুষের মধ্যেই সারা ভারতবর্ষ সেদিন যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

এমন অসামান্য ব্যক্তিত্ব, এমন পাণ্ডিত্য আর এতবড় কর্মশক্তি নিয়ে তাঁর পরে আজ পর্যন্ত আর একজন মানুষও জন্মাননি এশিয়ায়। একজনও না।

সাত-আটটা ভাষাই শিখেছিলেন। আর শেখবার কী আগ্রহ। মিশনারিদের সঙ্গে তর্ক করতে হবে? বহুত আচ্ছা! সঙ্গে সঙ্গে মূল বাইবেল পড়বার জন্যে হিব্রু ভাষা তিনি শিখে ফেললেন।

সে-মেধার তুলনা হয় না!

একবার এক বিরাট পণ্ডিত একখানা তন্ত্রের বই নিয়ে রাম-মোহনের সঙ্গে তর্ক করতে এলেন। তন্ত্রের সে-বইখানা রামমোহনের পড়া ছিল না। তিনি পণ্ডিতকে পরদিন আসতে বলে দিলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গেই শোভাবাজারের রাজবাড়ি থেকে চিঠি লিখে তন্ত্রের বইটি আনিয়ে নিলেন। এক রাত্রির পরিশ্রমে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করলেন দুরূহ বইখানা।

পরদিন পণ্ডিতের সঙ্গে শুরু হল বিচার। কী হল বিচারে? দুর্ধর্ষ পণ্ডিত হার মেনে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ের তলায়।

কত গল্প যে আছে রামমোহন সম্বন্ধে! দু-একটা বলি।

একবার এক ব্রাহ্মণ নাকি কঠিন রোগমুক্তির জন্যে দেবতার দুয়োরে ধর্না দেন। দেবতার স্বপ্নাদেশ হল: যদি তিনি তাঁদের গ্রামের একজন বুড়ো কলুর ছোঁয়া খান, তবে তাঁর রোগ সারবে।

কলুর ছোঁয়া! কী সর্বনাশ! জাত থাকবে না যে! ব্রাহ্মণ চোখে অন্ধকার দেখলেন। এক দিকে জাত, আর একদিকে প্রাণ। কোনটা রাখেন?

অগত্যা উপায় চাইতে গেলেন রামমোহনের কাছে।

রামমোহনের এ-সবে বিশ্বাস ছিল না। তবু ব্রাহ্মণের দশা দেখে তাঁর দয়া হল। তিনি বললেন, আপনি কলুকে নিয়ে জগন্নাথে চলে যান। সেখানে জাতি-বিচার নেই, সবাই সবার ছোঁয়া খেতে পারে।

চমৎকার সমাধান! ব্রাহ্মণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

আর একবার তাঁর বন্ধু কালীনাথ রায়চৌধুরী এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলেন। লোকটা কোথা থেকে একটা দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ নিয়ে এসেছে। এই শঙ্খ যার ঘরে থাকে, সে নাকি কোটি-পতি হয়, লক্ষ্মী অচলা হয়ে বাস করেন তার কাছে। পাঁচশো টাকায় শঙ্খটা কালীনাথকে বিক্রি করতে রাজী আছে সে।

লোভে পড়লেন কালীনাথ। তবু একবার মনে হল রাম-মোহনের পরামর্শ নেওয়াটা মন্দ কথা নয়।

শঙ্খওলাকে নিয়ে রামমোহনের কাছে উপস্থিত হলেন কালীনাথ। শুনে রামমোহন হাসলেন। শঙ্খওলাকে বললেন, বাপু হে, যে-শঙ্খের এত দাম, তুমি নিজেই বা তাকে মাত্র পাঁচশো টাকার জন্যে হাতছাড়া করছ কেন? ইচ্ছে করলে নিজেই যখন কোটিপতি হতে পারো, তখন হঠাৎ তোমার এই পরোপকারের বাসনা কী কারণে?

বলা বাহুল্য, এর জবাব শঙ্খওলা দিতে পারল না। তৎক্ষণাৎ পিঠটান দিল সে।

রামমোহন সম্বন্ধে এমন অসংখ্য গল্প আছে। সে-সব বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। কিন্তু তার দরকার কী। তাঁর নিজের জীবনই যে একখানা বিশাল মহাভারত!

কাজ করে চলেছেন রামমোহন। শিল্প-বিস্তার, সমাজ-সংস্কার, শাসন-সংস্কার, ব্যক্তি-স্বাধীনতার আন্দোলন, নারীর অধিকার। বইয়ের পর বই লিখে চলেছেন। বাংলায়—ইংরেজিতে।

তাঁর রচনা সম্পর্কে একটা কথা এখানে বলে রাখি। রামমোহন সাহিত্যিক ছিলেন না, সাহিত্য রচনার সময়ও তাঁর ছিল না। তাঁর সমস্ত লেখাই ধর্ম আর সমাজ-সংস্কারমূলক। তবু বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্মরণীয় দান রয়েছে। রামমোহনকে এ যুগের বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা বলা যেতে পারে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আধুনিক বাংলা গদ্যের সূচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই সবচেয়ে কৃতী।

কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাইরে থেকেও রামমোহন বাংলা গদ্য রচনায় আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। জটিল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেও কেমন করে সাহিত্যের রস আনা যায়, কত সরল সুন্দর ভাষায় কত কঠিন জিনিসকে ব্যাখ্যা করা চলে, রামমোহনের রচনা না পড়লে তা ধারণাও করা যাবে না। মৃত্যুঞ্জয়ের কঠিন পণ্ডিতী ভাষার পাশে পাশে রামমোহনের 'প্রবর্তক ও নিবর্তক সংবাদের' দুটি প্রস্তাব মিলিয়ে পড়লেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। রামমোহন পাণ্ডিত্য করতে চাননি—কিন্তু সহজ সুন্দর প্রাণের ভাষা লিখে তিনি বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তন করে দিয়েছিলেন। পরে এই ভাষাই বিদ্যাসাগরের হাতে সম্পূর্ণভাবে প্রাণ পেয়ে উঠেছিল।

এ-ছাড়া অসংখ্য গানও রচনা করেছিলেন তিনি—সেগুলিতে তাঁর কবিত্বশক্তির প্রচুর পরিচয় রয়েছে। তাঁর কয়েকটি গান আজও পরিচিত।

কিন্তু এখনও তাঁর আসল কাজ বাকি। এখনও সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সতীদাহের উতরোল কান্না। এখনো দেশের মায়ের জাত স্বার্থপর পুরুষের হাতে ভোগ করছে মৃত্যু-যন্ত্রণা। সমস্ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেই কান্না এসে রামমোহনের বুকে আঘাত করতে থাকে।

তা ছাড়া বৌদির চিতার পাশে বসে যে-প্রতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন, সে তো এখনো তাঁর পালন করা হয়নি! 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ' দুখণ্ডে প্রকাশ করে—সতীদাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখিয়েই তো তাঁর কর্তব্য শেষ হতে পারে না। এইবার তাঁকে নামতে হবে সতীদাহ নিরোধের সক্রিয় ভূমিকায়। দেশের বুক থেকে এত বড়ো পাপ চিরদিনের মতো উপড়ে ফেলতে হবে তাঁকে।

কর্মযোগী রামমোহন নতুন উৎসাহে রণক্ষেত্রে নেমে পড়লেন। আর এই সময় ভারতবর্ষে গবর্নর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক।



আট

এ-দেশে যে-সব ইংরেজ বড়লাট এসেছেন, তাঁরা অনেকেই অনেক রকম কুকীর্তি রেখে গেছেন। ওয়ারেন হেস্‌টিংস, লর্ড ডালহাউসি, লর্ড কার্জন কিংবা লর্ড উইলিংডনের মতো বড়লাটদের ভারতবর্ষের মানুষ কখনো ক্ষমা করতে পারবে না। ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থরক্ষার জন্যে এই সব ঝানো ইংরেজের দল যে-কোনো রকমের মিথ্যে চাতুরী আর নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি। এঁদের হীন কুৎসিত চক্রান্তের দুর্ভোগ আজও ভারতবর্ষের মানুষকে বইতে হচ্ছে। সবচেয়ে লজ্জা আর অপমানের কথা : আজ স্বাধীন হওয়ার পরেও এঁদের নানারকমের স্মৃতিচিহ্ন আমাদের কলকাতা শহরকেই কলঙ্কিত করে রেখেছে!

এঁদের মধ্যে অনেকখানি ব্যতিক্রম বলা যায় বেন্টিঙ্ককে। বেন্টিঙ্ক যে একেবারে মহাপ্রাণ ভারতপ্রেমিক ছিলেন তা নয়, তবে তাঁর মধ্যে বেশ কিছুটা উদারতা ছিল। নানা কারণে তাঁর প্রতি আমাদের কিছু কিছু কৃতজ্ঞতাব অবকাশ আছে। দেশের দস্যু দমন করে, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন আর সতীদাহ-প্রথা

আইন করে বন্ধ করে দিয়ে বেন্টিঙ্ক কয়েকটা খুব বড়ো কাজ যে করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

ভারতবাসীর ধর্মে-কর্মে বাধা দেওয়া ইংরেজ সরকারের আইনের বিরোধী। কাজেই প্রতিদিন চোখের সামনে সতীদাহের বীভৎস রূপ প্রত্যক্ষ দেখেও তাঁরা প্রতীকার করতে পারতেন না। বেন্টিঙ্কের অনেক আগেই লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমলে সতীদাহ-প্রথা শাস্ত্র-সম্মত কিনা এ-সম্বন্ধে নিজামৎ আদালতের পণ্ডিতদের মত চাওয়া হয়। তাতে পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা শাস্ত্র-বিচার করে জানিয়েছিলেন যে মাত্র কয়েকটি অবস্থাতেই সতীদাহ সমর্থন করা যেতে পারে। এবং, সতী হওয়াও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। জোর করে কোনো মেয়েকে মৃত স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা শাস্ত্র-সম্মত তো নয়ই—বরং তার বিরোধী।

তা সত্ত্বেও, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, একটা সভ্য শিক্ষিত জাতি কেমন করে এই নারীহত্যার আনন্দে খেপে উঠত। আরো আশ্চর্য—দেশের রাজা-মহারাজা, বড়ো বড়ো পণ্ডিত আর সমাজ-পতিরা এই প্রথাকে বজায় রাখবার জন্যে সেদিন প্রাণপণে আন্দোলন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব থেকে মহারাজা গোপীকৃষ্ণ, হরনাথ তর্কভূষণ, দেওয়ান রামকমল সেন, সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি কে না ছিলেন!

সতীদাহ বন্ধ করবার জন্যে রামমোহন এই সব প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়ে চলেছিলেন। তাঁর 'প্রবর্তক-নিবর্তকে' এবং 'সম্বাদ কৌমুদীতে' তিনি যেমন সতীদাহের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক উপস্থিত

করছিলেন, তেমনি ভবানীচরণের 'সমাচার-চন্দ্রিকা'য় ধর্মবিরোধী ম্লেচ্ছ রামমোহনের নিন্দাবাদ চলছিল।

বিরোধী পক্ষ রামমোহনের 'ব্রহ্ম-সভার' পালটা আর-একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, তার নাম 'ধর্মসভা।' ব্রহ্মসভা আর ধর্মসভার মধ্যে সেদিনের যে-লড়াই, তাকে সংক্ষেপে প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার যুদ্ধ বলা যেতে পারে। একদিকে সত্য অন্যদিকে সংস্কার। একদিকে যুক্তি, আর একদিকে অন্ধতা।

এ-দেশে পা দিয়েই রামমোহনের সম্বন্ধে বেন্টিঙ্ক অনেক খবর পেয়েছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস আর সত্যনিষ্ঠার জন্যে বেন্টিঙ্ক তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। নানাভাবেই রামমোহনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল।

রামমোহনের আত্মসম্মান-জ্ঞান যে কত সজাগ ছিল, এখানে তার একটা গল্প বলি।

একবার সতীদাহ নিয়ে আলোচনার জন্যে বেন্টিঙ্ক রামমোহনের কাছে তাঁর এ-ডি-কং অর্থাৎ দেহরক্ষীকে পাঠিয়েছেন। এ-ডি-কং এসে সেলাম দিয়ে সরকারী কেতায় জানাল: ভারতের মহামান্য গবর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক রামমোহন রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চান।

রামমোহন জানালেন, তিনি যেতে পারবেন না। তিনি সামান্য মানুষ, ধর্মকর্ম নিয়ে কাল কাটান, লাটসায়েবের সঙ্গে তাঁর দেখা করবার স্পৃহা নেই!

অন্য কোনো বড়লাট হলে জিনিসটা কী ভাবে নিতেন কে জানে, কিন্তু বেন্টিঙ্ক ছিলেন একটু অন্য ধাতের মানুষ। ব্যাপারটা

তিনি বুঝতে পারলেন। আবার তাঁর দেহরক্ষাকে পাঠালেন রামমোহনের কাছে।

এবার এ-ডি-কং এসে সবিনয়ে জানাল : মিস্টার উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক রামমোহন রায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারলে অত্যন্ত খুশি হবেন।

গবর্নর জেনারেলের আদেশে রামমোহন যাননি—কিন্তু মিস্টার বেন্টিঙ্কের ডাকে তাঁকে সাড়া দিতে হল।

এমনি আত্মমর্যাদা-বোধ ছিল রামমোহনের।

ভারতবর্ষের বীভৎস সতীদাহ-প্রথা বেন্টিঙ্ককে অত্যন্ত পীড়া দিত। তা ছাড়া সতীদাহের ওপরে জে পেগ্‌স্‌ নামে একজন ইংরেজ একখানা বই লিখেছিলেন তখন : "ব্রিটেনের উদ্দেশে সতীর ক্রন্দন।" বইটিতে সতীদাহের যে ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠেছিল, বেন্টিঙ্ক তাতে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন। এদিকে প্রতি বছরেই সতীদাহের সংখ্যাও বেড়ে চলেছিল। এক কলকাতা-বিভাগেই চার বছরে কতগুলি সতীদাহ হয়েছিল, এখানে তার একটা হিসেব দিচ্ছি :

বছর		সতীর সংখ্যা
১৮১৫	...	২৫৩
১৮১৬	...	২৮৯
১৮১৭	...	৪৪২
১৮১৮	...	৫৪৪

এটা তখনকার দিনের মোটামুটি সরকারী হিসেব, কিন্তু আসলে সতীদাহ এর অন্তত দ্বিগুণ বা তিনগুণ হয়েছিল এ-রকম

মনে করা যেতে পারে। এই হিসেব থেকেও দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক বৎসর কী অস্বাভাবিকভাবে সতীদাহ বেড়ে চলেছিল। ১৮১৮ সালের সংখ্যা ১৮১৫ সালের দ্বিগুণেরও বেশি!

শুধু বই লেখাই নয়—বেন্টিঙ্ক আসবার আগে থেকেই ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে সতীদাহ বন্ধ করবার জন্যে রামমোহন আবেদন করে আসছিলেন। সতীদাহের যাঁরা সমর্থক, তাঁরাও চুপ করে বসে ছিলেন না। সতীদাহের প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁদের যুক্তি ছিল এইরকম :

"যে-হেতু স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েরা নীচু স্তরের জীব, তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কম, তাদের কোনো মনের জোর নেই, তারা বিশ্বাসের অযোগ্য, তারা অজ্ঞ, এবং যে-হেতু শাস্ত্রের হুকুমে তারা বিধবা হয়ে সংসারের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য, সেই জন্যে তাদের এইভাবে পুড়িয়ে মারাই উচিত!"

নিজেদের মা-মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধার নমুনাটা ছ্যাখো একবার! অথচ আমরা ভারতবাসীরা নাকি মেয়েদের দেবী বলে মাথায় তুলে রাখি!

সিংহ-গর্জনে রামমোহন এর প্রতিবাদ করলেন। তীক্ষ্ণধার যুক্তিতর্কে প্রমাণ করে দিলেন, মেয়েরা কোনো অংশে পুরুষের চাইতে নিকৃষ্ট তো ননই—বরং অনেক দিক থেকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ। এবং সতীদাহের পেছনে হিংস্র বর্বরতা ছাড়া আর কোনো সত্যই থাকতে পারে না!

যুক্তিতে হেরে গিয়ে প্রতিপক্ষ রামমোহনের সর্বনাশ কামনা করতে লাগলেন। এমন সময় বেন্টিঙ্কের আবির্ভাব হল।

সতীদাহ-সম্পর্কে বেণ্টিঙ্ক তো আগে থেকেই বিরূপ ছিলেন। রামমোহনের লেখা পড়ে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি স্থির করলেন, ভারতবর্ষ থেকে এ-প্রথা তিনি উচ্ছেদ করেই দেবেন।

মৌচাকে যেন ঢিল পড়ল।

রক্ষণশীলদের কাগজ 'সমাচার-চন্দ্রিকা' চিৎকার করে উঠল। হিন্দুর ধর্ম গেল—জাত গেল—সর্বনাশ হল! বেণ্টিঙ্ক যেন এমন অন্যায় কাজ কিছুতেই না করেন!

ওদিকে দেশের লোকেরও তখন একটু একটু করে ঘুম ভাঙছে। রামমোহনের দলেও লোকের অভাব হল না। 'সম্বাদ ভাস্করের' সম্পাদক বিখ্যাত পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ রামমোহনকে পুরোপুরি সমর্থন জানালেন।

দেশে যেন ঝড় উঠল। দুদিকে ভাগ হয়ে গেল হিন্দু সমাজ। আর শেষ পর্যন্ত—

রামমোহনেরই জয় হল। ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন পাশ হয়ে গেল।



নয়

ধর্মধ্বজীরা খেপে উঠলেন।

অসম্ভব—এ কিছুতেই সহ্য করা যাবে না। দেশের রাজা মহারাজা থেকে শুরু করে ভাটপাড়ার দিগ্‌গজ পণ্ডিত পর্যন্ত প্রায় আটশো লোক সতীদাহের সপক্ষে দরখাস্তে সই করেছেন। তবু আইন পাশ হয়ে গেল! তা হলে কি ঘোর কলি উপস্থিত?

এর প্রতীকার করতে হবে! ম্লেচ্ছ রামমোহনের ভাঁওতায় পড়ে খ্রীষ্টান বেণ্টিঙ্ক সনাতন হিন্দুধর্মের এতবড় অপমান করবে—এ কিছুতেই হতে পারে না। দরখাস্ত পাঠাও বিলেতে। প্রিভি-কাউন্সিলে। তোলো চাঁদা।

উঠল চাঁদা। দু-পাঁচশো নয়—একেবারে বিশ হাজার টাকা! রাজা মহারাজারা তো টাকা দিলেনই, ধর্মসভার লোকের চাঁদার উৎপাতে সাধারণ মানুষের রাস্তায় চলাই দায় হল। যাকে সামনে পায়, তাকেই ধরে: চাঁদা দাও—সতীদাহ আইনের বিরুদ্ধে বিলেতে দরখাস্ত পাঠাতে হবে! লোকে জেরবার হয়ে উঠল।

শেষ পর্যন্ত ধর্মসভার পক্ষ থেকে ফ্রান্সিস্ বেথি নামে একজন ইংরেজ অ্যাটর্নিকে বিলেতে পাঠানো হল টাকা আর দরখাস্ত দিয়ে।

রামমোহনের ব্রহ্মসভাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। তাঁরাও পালটা রামমোহনকে বিলেতে পাঠাবার তোড়জোড় করতে লাগলেন।

ওদিকে রামমোহনের জীবন প্রায় বিপন্ন হয়ে উঠেছে। তাঁকে খুন করবার জন্যে ভাড়াটে গুণ্ডা ঘুরে বেড়ায়। আত্ম-রক্ষার জন্যে সব সময়ে একখানা গুপ্তি সঙ্গে নিয়ে বেরুতে হয় রামমোহনকে। তাঁর বাড়ির চারদিকে ঘিরে ঘিরে কুৎসিত ভাষায় গান চলতে থাকে :

"জাতের নিকেশ রামমোহন রায়
বিত্তের নিকেশ করেছে—"

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে কিছুদিনের জন্যে পুলিসের সাহায্য পর্যন্ত নিতে হয়েছিল রামমোহনকে।

ওদিকে বেথি বিলেতে রওনা হয়ে গেছেন— আর অপেক্ষা করা চলে না। এ পক্ষ থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইত্যাদি রামমোহনের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করে এনেছিলেন। কিন্তু সে-টাকা রামমোহন নিলেন না— ব্রাহ্ম-সমাজকে তা দান করে দিলেন। তিনি নিজের টাকাতেই বিলেত যাবেন।

কিন্তু টাকা কোথায়?

সুযোগ এসে গেল অদ্ভুতভাবে।

ভারতবর্ষে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যপাট চলছে। কিন্তু দিল্লীতে তখনও নামমাত্র একজন বাদশা রয়েছেন: দ্বিতীয় আকবর।

এই দ্বিতীয় আকবর তাঁর কতগুলো ন্যায্য অধিকার নিয়ে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে আবেদন করেছিলেন।

কোম্পানি সে-আবেদন গ্রাহ্য করল না। অগত্যা নিরুপায় হয়ে দ্বিতীয় আকবর ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছে একজন 'এল্‌চি' বা দূত পাঠাবেন বলে স্থির করলেন।

স্বয়ং বাদশার দূত হতে পারে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এমন আর কোন দ্বিতীয় মানুষ ভারতবর্ষে আছে রামমোহন ছাড়া? অতএব প্রস্তাব এল রামমোহনের কাছেই। দিল্লীর বাদশা তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে চান।

রামমোহন সঙ্গে সঙ্গেই সে-প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। বাদ্‌শার কাজ তো আছেই, তাছাড়া কিছুদিনের মধ্যেই প্রিভি-কাউন্‌সিলে সতীদাহ বিলের আলোচনাও শুরু হবে। যেমন করে হোক সে-সময় তাঁর সেখানে থাকা দরকার। এত করে শেষে ঘাটে এসে নৌকো ডুবতে দেওয়া যাবে না।

রামমোহন তৎক্ষণাৎ বিলেত যাওয়ার জন্যে তৈরি হলেন।

কিন্তু বাধা এল দু-দিক থেকে।

প্রথম বাধা দিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। তারা রামমোহনকে দূত বলে মানতে চাইল না, তাঁর 'রাজা' উপাধিও স্বীকার করতে রাজী হল না। কে এখন দিল্লীর বাদশা—কে আর মানে তাকে?

রামমোহন বললেন, তথাস্তু। সাধারণ মানুষ রামমোহন সাধারণভাবেই বেড়াতে যাবে বিলেতে।

অগত্যা ছাড়পত্র দিতে হল কোম্পানিকে।

দ্বিতীয় বাধা হিন্দু-সমাজ।

ব্রাহ্মণের ছেলে বিলেত যাবে? কালাপানি পার হবে? একঘরে করব—মুখদর্শনও করব না।

কিন্তু এ-বাধায় থমকে যাবেন কেন রামমোহন? সমাজ একঘরে করতে তাঁকে বাকিই বা রেখেছে কোথায়? বিলেত যাওয়ার সব বন্দোবস্তই তিনি করে ফেললেন।

তাঁর যাওয়ার আগেই একটা বিচিত্র সংবাদ এল।

স্যার ফ্রান্সিস্ বেথি যে-জাহাজে করে 'ধর্মসভার' দরখাস্ত নিয়ে গিয়েছিলেন—ঝড়ে ডুবে গেছে সে-জাহাজ। বেথি কোনো-মতে প্রাণ বাঁচিয়েছেন, কিন্তু কাগজপত্র সব গেছে।

রামমোহন হেসে উঠলেন।

বেথির জাহাজ ডুবেছে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ সতীর দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ে, কিন্তু তাদের আশীর্বাদে আমার জাহাজের পালে লাগবে উনপঞ্চাশ পবনের বেগ।

শেষ পর্যন্ত ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে 'অ্যাল্‌বিয়ন' জাহাজে চড়ে রামমোহন ইয়োরোপের পথে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করলেন। সঙ্গে গেলেন রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, পালিত পুত্র রাজারাম, দুজন চাকর রামহরি দাস আর সেখ বক্সু।



দশ

এখনকার দিন নয় যে দমদম বিমানঘাঁটি থেকে প্লেনে উঠলে, আর মেঘের বুক চিরে সাগর-পাহাড় ডিঙিয়ে দেখতে না দেখতে লণ্ডনের ক্রয়ডন এয়ার-পোর্টে গিয়ে নামলে! তখন সুয়েজের খাল পর্যন্ত কাটা হয়নি—ভারতবর্ষ থেকে বিলেত যেতে হলে পুরো ছটি মাস সময় লাগত।

পড়েন, লেখেন, ডেকে পায়চারি করেন আর সঙ্গী যাত্রীদের সঙ্গে ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি এই সব নিয়ে আলোচনা করেন রামমোহন। চলতে চলতে জাহাজ কেপ-টাউনে গিয়ে পৌঁছুল।

একটা দুর্ঘটনা ঘটল এখানে। জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে পড়ে একখানা পা ভেঙে গেল রামমোহনের। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ভাঙা পা তাঁর আর জোড়া লাগেনি।

কিন্তু পা ভাঙলে কী হয়—মনে তাঁর অদম্য শক্তি। এই কেপ-টাউনেই তিনি একদিন দুখানি ফরাসী জাহাজ দেখতে পেলেন। বিপ্লবের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ছে তাদের ওপর।

শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা ভুলে গেলেন রামমোহন—সেই অবস্থাতেই তিনি মুক্তিযোদ্ধা ফরাসীদের অভিনন্দন জানাতে ছুটে

গেলেন তাদের জাহাজে। মাথার ওপরে সেই উড়ন্ত স্বাধীনতার পতাকার দিকে তাকিয়ে উচ্ছল আনন্দে বলতে লাগলেন, Glory, glory, glory to France—ফ্রান্স, ধন্য, ধন্য, ধন্য!

১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রিল রামমোহন লিভারপুলে পৌঁছুলেন। স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা এগিয়ে এল চারদিক থেকে।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়ম রস্কো লিভারপুলে থাকতেন। এতদূরে থেকেও তিনি রামমোহনের আশ্চর্য পাণ্ডিত্য আর প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। টমাস্ হাড্সন ফ্লেচার নামে লিভারপুলের এক ভদ্রলোক তখন ভারতবর্ষে যাত্রা করছিলেন, রামমোহনের প্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর হাতে একটা দীর্ঘ চিঠিও লিখেছিলেন রস্কো।

কিন্তু সে-চিঠি রামমোহনের কাছে পৌঁছুবার আগেই রামমোহন লিভারপুলে পৌঁছেছিলেন। রস্কো তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। রামমোহনকে সম্বর্ধনা জানিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাষায় রস্কো বললেন, ভগবানকে ধন্যবাদ যে আজকের দিনটি পর্যন্ত বেঁচে থাকবার সুযোগ আমি পেয়েছি।

ইংল্যাণ্ডে তখন নতুন রেললাইন হয়েছে। সেই রেলে চেপে রামমোহন লিভারপুল থেকে ম্যাঞ্চেস্টারের কল-কারখানা দেখতে গেলেন। কারখানার কুলি-মজুররাও বুঝি এই অসামান্য পুরুষটিকে চিনতে পেরেছিলেন—ছুটে এসে রামমোহনকে প্রীতির আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন তাঁরা। হাজার হাজার লোক এমন ভাবে এসে জড়ো হল যে কর্তৃপক্ষ শেষে কারখানার দরজা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন।

লিভারপুল থেকে লণ্ডনে। পথে যেখানেই তিনি বিশ্রাম করেন, কৌতূহলী মানুষ ভিড় করে তাঁকে দেখতে।

লণ্ডনে পৌঁছে বাসা নিলেন রিজেন্ট স্ট্রীটে। সারা শহর তোলপাড়। ভারতবর্ষের এই অসামান্য মানুষটিকে দেখবার জন্যে সংখ্যাতীত লোক ছুটে আসতে লাগল। রাজনীতিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক কারা না ছিলেন তাঁদের মধ্যে! বেলা এগারোটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত তাঁর দরজায় গাড়ির ভিড় জমে থাকত। বন্ধ হয়ে যেত রাস্তা।

প্রথম যখন রামমোহন লণ্ডনে পৌঁছোন, তখনই একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। সাময়িকভাবে রামমোহন বণ্ড স্ট্রীটের একটা হোটেলে এসে উঠেছেন। মধ্য রাত্রিতে যখন হোটেলের সবাই ঘুমন্ত, তখন একজন বুড়ো মানুষ হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এলেন রামমোহনকে দেখতে। তিনি এইমাত্র খবর পেয়েছেন যে রামমোহন লণ্ডনে পৌঁছেছেন।

এই লোকটি যে-সে নন্—দিকপাল দার্শনিক পণ্ডিত জেরেমি বেন্থাম স্বয়ং। বার্ধক্যের জন্যে বেন্থাম কয়েক বছর যাবৎ কারো সঙ্গেই দেখাসাক্ষাৎ করতেন না। কিন্তু রামমোহনের সংবাদে তিনি নিজের বিশ্রাম ফেলে ছুটে এসেছেন।

ইয়োরোপের বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা রামমোহনের প্রতিভাকে কতখানি সম্মান করতেন এই ঘটনাই তার প্রমাণ।

কাজের মানুষ রামমোহন লণ্ডনে পৌঁছেই কাজে ডুব দিলেন। তাঁর ভাঙা পার অবস্থা তখনো ভালো নয়—ডাক্তারেরা বিশ্রাম নিতে বলেছেন। কিন্তু সময় কই রামমোহনের! দ্বিতীয়,

আকবরের কাজ বাকি, সতীদাহ বিল রয়েছে, ইংল্যাণ্ডের প্রজাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বিস্তারের জন্যে পার্লামেণ্টে রিফর্ম বিল আলোচনা হচ্ছে—সে-আলোচনা শুনতে হবে তাঁকে। ভারত-বর্ষের মানুষ হয়েও স্বাধীনচেতা রামমোহন এই রিফর্ম বিল সম্পর্কে এত বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন যে প্রকাশ্য সভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন : এ বিল যদি পাশ না হয়, তাহলে তিনি আর ইংল্যাণ্ডের প্রজা হয়ে থাকবেন না—আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করবেন!

খ্যাতি আর সমাদর চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগল তাঁর কাছে। ভারতবর্ষে থাকতে উদ্ধত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁর রাজা উপাধি মানতে চায়নি। কিন্তু এখানে সে-সম্মান ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে। উদ্ধত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ করল। কোম্পানির চেয়ারম্যান উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁকে সম্বর্ধনা করে বললেন, "যেমন মৌমাছি বাগানের ফুলগুলো থেকে সব চাইতে মিষ্টি মধু আহরণ করে, তেমনি এই ব্রাহ্মণও অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে ভ্রমণ ও পঠনের মধ্য দিয়ে উচ্চতম মানসিক প্রকর্ষ আয়ত্ত করেছেন।" রাজা চতুর্থ উইলিয়মের অভিষেক-উৎসবে অন্যান্য দেশের রাজদূতদের সঙ্গে তাঁকে আসন দেওয়া হল। নতুন লণ্ডন ব্রীজের উদ্‌বোধন উপলক্ষে রাজা উইলিয়ম যে-ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেখানেও রামমোহনকে পরম সমাদরে আহ্বান করা হয়েছিল।

তখনকার দিনে ইয়োরোপে কোনো কালা আদমির এত বড়ো

সম্মান কল্পনারও অগোচর ছিল। কিন্তু এশিয়ার পুরুষসিংহ নিজের শক্তিতেই সেদিন তা আদায় করে নিতে পেরেছিলেন।

সতীদাহ-বিলের কাজ তো ছিলই, আরো অনেক বড়ো কর্তব্য ছিল সামনে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নতুন শাসন-তন্ত্র রচনা করছিল। এই উপলক্ষে হাউস্ অব্ কমন্‌সে একটি সিলেক্ট কমিটির সামনে রামমোহনকে সাক্ষী দেবার জন্যে আমন্ত্রণ করা হয়। এই সুযোগই রামমোহন চাইছিলেন। দেশের নানামুখী সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে রামমোহন যেদিন সিলেক্ট কমিটির সামনে যে-সব আলোচনা করেছিলেন, সেগুলিতে একদিকে তাঁর গভীর দেশাত্ম-বোধ, অন্যদিকে তাঁর অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। এই সব বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁকে সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল :

১। ভারতবর্ষের রাজস্ব-প্রথা : এ সম্বন্ধে রামমোহনকে চুয়ান্নটি প্রশ্ন করা হয়। রামমোহন প্রজাস্বত্ব, খাজনার হার, কৃষক এবং জনসাধারণের উন্নতি-সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন।

২। ভারতের বিচার-পদ্ধতি : এ নিয়ে রামমোহনকে আটাত্তরটি প্রশ্ন করা হয়। রামমোহন বিস্তৃত উত্তর দেন।

৩। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আরো অতিরিক্ত কতগুলি প্রশ্নের জবাবও তাঁকে দিতে হয়।

৪। ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয়দের বসবাস সম্পর্কেও তাঁর অভিমত গ্রহণ করা হয়।

৫। ভারতবর্ষের প্রজাদের অবস্থা : এ-বিষয়ে রামমোহন বিস্তৃতভাবে সাক্ষ্য দেন।

রামমোহনের এইসব মতামত ব্রিটিশ-গবরনমেণ্ট্ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী কালে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নতুন শাসনতন্ত্রে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। সে-যুগের পক্ষে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার জন্যে যতখানি করা সম্ভব রামমোহন তা প্রাণপণে করতে চেয়েছিলেন। অথচ আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে আজো রামমোহনকে আমরা ভালো করে চিনতে শিখিনি, তাঁর উপযুক্ত মর্যাদাও দিতে পারিনি।

রামমোহন সিলেক্ট কমিটির সামনে যে-সব কথা বলেছিলেন, তা এখানে লিখতে গেলে এক বিরাট পুথি হয়ে দাঁড়াবে। তোমরা বড়ো হয়ে সে-সব পড়ে নিয়ো। আমরা কেবল দু-একটি প্রশ্নের নমুনা এবং রামমোহন কীভাবে তাদের উত্তর দিয়েছিলেন, তাই এখানে তুলে দিচ্ছি। আশা করি, এ থেকেই তোমরা রামমোহনকে চিনে নিতে পারবে।

প্রশ্ন : 'বর্তমানে বাংলা দেশে জমিদারি প্রথা এবং মাদ্রাজের রায়ৎওয়ারি প্রথার ফলে প্রজাদের কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে ?'

উত্তর : 'এই দুটি প্রথার ফলেই গরিব প্রজাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। একদিকে জমিদারের স্বার্থপরতা আর লোভ তাদের সর্বনাশ করছে, অন্যদিকে রাজস্ব-বিভাগের সরকারী আমীন আর আমলাদের চাপে তাদের প্রাণান্ত। আমি এ-জন্যে অত্যন্ত মর্মপীড়া বোধ করি। বাংলাদেশের জমিদারেরা খাজনার হার বাড়ানোর ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে যা খুশি প্রশ্রয় পায় আর গরিব চাষীরা সব রকম সুযোগ থেকেই বঞ্চিত। কোনো বছর যদি বাড়তি

ফসল হয় আর ফসলের দাম কমে যায়, তাহলে চাষীদের প্রায় সব ফসল বেচে দিয়ে জমিদারের খাজনা মেটাতে হয়, তাদের ঘরে না থাকে এতটুকু খাবার, না থাকে এক মুঠো বীজধান!'

মনে রেখো, রামমোহন নিজেও জমিদার ছিলেন—অথচ তা সত্ত্বেও জমিদারি-প্রথার সম্পর্কে কেমন স্পষ্ট ভাষায় সত্যকে তুলে ধরেছিলেন তিনি!

আর একটি প্রশ্ন : 'আপনি ভারতবর্ষের বিচার-প্রথায় কতগুলো দোষত্রুটি দেখিয়েছেন। কীভাবে তাদের সংশোধন করা যায় বলে আপনি মনে করেন?'

উত্তর : 'ভারতবাসীর রীতি-নীতি, ভাষা, চাল-চলন, সমাজ এবং ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে ইয়োরোপীয় বিচারপতিরা কিছুই জানেন না। সুতরাং তাঁদের পক্ষে কখনোই সুবিচার করা সম্ভব নয়। অপর পক্ষে যাঁরা ভারতবাসী তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কাছ থেকে পেয়েছেন পরাধীনতা আর উপেক্ষা, তাই দেশীয় বিচারকদেরও সাধারণের কাছে কোনো মর্যাদা নেই। সুতরাং আমার মতে, ভারতীয়দের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ইয়োরোপীয়দের ন্যায়পরায়ণতা মিলিত হলেই দেশে সুবিচার সম্ভব হতে পারে।'

রামমোহন যে-যুগে বাস করে গেছেন, সে-কালে ইয়োরোপীয়দের সম্পর্কে এই শ্রদ্ধাটুকু একেবারে অসঙ্গত ছিল না। কিন্তু আরো কিছুদিন পরে যদি রামমোহন বেঁচে থাকতেন, তা হলে এ-কথা নিশ্চয় বলতেন : 'হে বিলিতী প্রভুরা, তোমাদের

সুবিচারের নমুনা তো অনেক দেখা গেল, এবার দয়া করে চাঁটি-বাটি তোলো। আমাদের ভালমন্দ এখন আমরাই বুঝব, তোমাদের আর কষ্ট করে আমাদের খবরদারি করতে হবে না।'

কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই--সেটা ১৮৩১ সাল। তখনো ইংরেজদের দাঁত-নখ এমন করে বেরিয়ে আসেনি, তখনো ভারত-বর্ষে সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন জ্বলেনি।



এগারো

এর মধ্যে সতীদাহ বিলের আলোচনাও শেষ হয়ে গেছে প্রিভি-কাউন্সিলে। নিজের রাশি রাশি ধারালো যুক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন পুরুষ-সিংহ, ধর্মসভার দরখাস্ত তার সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ফ্রান্সিস বেথির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল—বৌদির চিতার পাশে বসে যে-প্রতিজ্ঞা রামমোহন করেছিলেন, সে-প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হল তাঁর।

ভারতবর্ষ থেকে সতীদাহের পাপ মুছে গেল চিরদিনের জন্যে।

সভা, সম্বর্ধনা আর অভিনন্দন চারদিকে। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় কই! আজ এখানে বক্তৃতা, কাল ওখানে, পরশু সেখানে। রামমোহন এখন রিজেন্ট স্ট্রীটের বাসা ছেড়ে ডেভিড হেয়ারের ভাইয়ের বাড়িতে উঠে এসেছেন। হেয়ার-পরিবার রামমোহনকে আপনার লোকের মতোই আদরযত্ন করতেন। হেয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে এঁদের সঙ্গে তাঁর প্রায় আত্মীয়তার সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল।

বিলেতের সমাজ-জীবনে রামমোহনের কী অপরিসীম প্রভাব পড়েছিল, সে সম্বন্ধে একটা মজার ব্যাপার বলি। বিশেষ করে

হিন্দু-মুসলমান-ক্রীশ্চান-বৌদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর যে উদার আদর্শ—তাই নিয়ে চারদিকে যে কতখানি আলোড়ন উঠেছিল, তার নমুনা পাওয়া যায় একটি কৌতুক-নাটিকায়। নাটিকার নাম হল : "ভারতে নতুন গবর্নমেন্টের পরিকল্পনা।" এই নাটকে পার্লিয়া-মেন্টের একজন সদস্যপদপ্রার্থী বক্তৃতা দিয়ে বলছেন : "অতএব আমার মতে রাজা রামমোহন রায়কে ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল করা হোক। বিচারপতি করা হোক মুসলমানদের—হিন্দুদের দেওয়া হোক রাজস্ব-বিভাগের ভার। পলিস বিভাগের ভার নিক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানেরা। এই প্ল্যানের বিশেষত্ব হল এই : রাম-মোহন না হিন্দু, না মুসলমান, না ক্রীশ্চান এবং ভারতবর্ষের কোনো সম্প্রদায়ের ওপরেই তাঁর কোন পক্ষপাত নেই। বাকি প্রত্যেকেই যখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে থাকবে—তখন সেই নানা বিরোধী-মতের আঘাতে আঘাতে ভারতীয় শাসন-যন্ত্র গড় গড় করে এগিয়ে চলবে।"

কৌতুকের মধ্য দিয়েও লেখক রামমোহনের সত্য পরিচয়টিই তুলে ধরেছিলেন।

সিলেক্ট কমিটির সামনে যে-সব আলোচনা সেদিন রাম-মোহন করেছিলেন, ইংরেজ সরকার তার সম্পূর্ণ মর্ম সেদিন বোঝেনি; অথবা বুঝতেও চায়নি। যদি ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র গড়বার সময় তাঁর পরামর্শ উপযুক্তভাবে নেওয়া হত—তা হলে তা থেকে অনেক সুফল ফলত। কারণ—রামমোহন স্বপ্ন-বিলাসী ছিলেন না। তাঁর বুদ্ধি ছিল যেমন সজাগ, যুক্তি ছিল তেমনি ধারালো।

রামমোহন সম্বন্ধে ডক্টর ল্যাণ্ট্ কার্পেণ্টার লিখেছেন : "স্বদেশের জন্যে অনেক—অনেক বড় কাজ তিনি (রামমোহন) করতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের জন্যে যা করা হয়েছে বা করা যেতে পারে, তাদের সব কিছু সম্বন্ধেই তিনি সর্বদা তীব্রভাবে সচেতন থাকতেন।—ইংল্যাণ্ডের আইনসভার সঙ্গে তাঁর যে-সব যোগা যোগ, তা থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, গভীর বিচারশক্তি আর সুসমঞ্জস চিন্তাধারার পরিচয় মেলে। .... তাঁকে একাধারে দেশ-প্রেমিক আর দার্শনিকের সংজ্ঞা দেওয়া যায়। তাঁর সিদ্ধান্ত-গুলো বাস্তব জ্ঞানের উজ্জ্বল নিদর্শন। এ কথা বিশ্বাস করা যায়, যে, আমাদের সরকার তাঁর মতামতের উচ্চ মূল্য দিয়েছিলেন, এবং ভারতীয় জন-সাধারণের ভালোমন্দ নির্ধারণ করার জন্য যে নতুন শাসনতন্ত্র গড়া হয় রামমোহনের দ্বারা তা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।"

কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এসেই রামমোহনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। আর-একটি দেশে যতক্ষণ না তিনি পৌঁছতে পারছেন, যতক্ষণ না সে-দেশের এক মুঠো মাটি তুলে তিলক পরছেন নিজের কপালে, ততক্ষণ ইয়োরোপে আসাই যে তাঁর অসার্থক হয়ে রইল !

সেই দেশটির নাম ফ্রান্স।

রুশো-ভোল্‌তেয়ার-দিদারোর জন্মভূমি। এই দেশেই লেখা হয়েছে 'সোস্যাল কণ্ট্রাক্ট্'—এই দেশের 'এনসাইক্লোপিডিস্ট' লেখকেরাই সারা পৃথিবীতে স্বাধীন চিন্তার আর বৈপ্লবিক মনো-ভাবের জোয়ার এনেছেন। এই ফ্রান্সেই ঘোষিত হয়েছে : সাম্য,

স্বাধীনতা আর ভ্রাতৃত্বের বাণী, এখানেই ভেঙেছে বাস্তিলের কারাগার, এখানেই ফরাসী-বিপ্লবের রক্তমশাল জ্বলেছে আগামী ইতিহাসের সূর্যোদয়ের মতো।

ফ্রান্সে রামমোহনকে যেতেই হবে!

অতএব ফ্রান্সে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে তিনি পারীর বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে একখানা দরখাস্ত করেন। এই দরখাস্তখানা নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিকদের মতে এতে দেশ ও জাতি-নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের একতার বাণী শুনিয়েছেন রামমোহন। এমনকি, তখনকার দিনেও আজকের মতো একটি লীগ অব নেশনস্ বা জাতিসংঘ গঠন করে পৃথিবীতে শান্তি ও মিত্রতা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এই দরখাস্তে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন দেশে যাতায়াতের মধ্যে যে ছাড়পত্র-প্রথা এবং নানা রকম বিধি-নিষেধ, এই দরখাস্তে রামমোহন তার প্রতিবাদ করেছেন। মানবতার যে উদার মহান্ আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, সেখানে জাতিতে জাতিতে ঘৃণা আর সন্দেহের সম্পর্ক তাঁকে অত্যন্ত পীড়া দিত। রামমোহন জানতেন নানা দেশের মানুষের মধ্যে সহজ মেলামেশা আর ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই সত্যি-কারের আন্তর্জাতিক প্রীতি ও মৈত্রী গড়ে উঠতে পারে। ছাড়-পত্র-প্রথার কড়াকড়ির মধ্যে যে অবিশ্বাস ও জাতিগত দূরত্ব আছে, রামমোহনকে তা কতখানি দুঃখ দিয়েছিল, তাঁর দরখাস্তে সে কথা তিনি এইভাবে বলছেন: "আমি ভেবেই পাই না, অন্যান্য বিষয়ে যে ফরাসী জাতি সৌজন্য এবং ঔদার্যের জন্যে বিখ্যাত, তার দেশে এমন প্রথার অস্তিত্ব থাকে কেমন করে!"

দুটি দেশের রাজনৈতিক বিরোধ যদি এই ছাড়পত্র-প্রথার প্রধানতম কারণ হয়, তার সম্পর্কেও চমৎকার সমাধানের ইঙ্গিত রামমোহনের এই দরখাস্তে আছে। তিনি লিখেছিলেন, খুব সহজভাবে পারস্পরিক সহযোগিতাতেই তো এর মীমাংসা করা যায়। "দুটি দেশের পার্লিয়ামেন্ট থেকেই সমানসংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি সম্মেলন প্রত্যেক বছর করা হোক এবং রাজনৈতিক মতভেদের সমস্যাগুলো উপস্থিত করা হোক সেখানে। ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হোক এবং দুটি দেশ থেকে পালা করে সভাপতি নির্বাচিত হোন। এক বছর সম্মেলনের স্থান নির্বাচিত হোক এক দেশে, পরের বছর হোক অন্য দেশে। ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের ব্যাপারে—এ বছর যদি ডোভারে সম্মেলন হয়, পরের বছর তা হোক ক্যালেতে।

এই ধরনের সম্মেলনের সাহায্যে দুটি সভ্যদেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক সব রকম পার্থক্যেরই অবসান ঘটানো যেতে পারে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এইভাবে সহজেই সব সমস্যারই সমাধান হতে পারে, উভয় পক্ষই সম্পূর্ণভাবে খুশি হতে পারেন এবং বংশানুক্রমিকভাবে দুটি দেশের মধ্যে প্রীতি আর শান্তি অব্যাহত থাকতে পারে!"

পরবর্তীকালে জাতিসংঘ গঠন করে শান্তিপূর্ণ ভাবে বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের পূর্বাভাস রামমোহন এইভাবেই সেদিন দিয়ে-ছিলেন। ইয়োরোপের কাছে শান্তি এবং মৈত্রীর বার্তা বয়ে নিয়ে যাওয়া রামমোহনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বহুদিন পরে রাম-মোহনের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ এই মিলনমন্ত্রই নিয়ে

গিয়েছিলেন ইয়োরোপের মানুষের প্রাণে ; রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রেমের ও কল্যাণের বাণী নোবেল্ পুরস্কারের শ্রদ্ধাঞ্জলি এনে দিয়েছিল তাঁর পায়ের কাছে।

রামমোহনের এই আবেদন-পত্র ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। পরম সমাদরে রামমোহনকে তিনি ফ্রান্সে আমন্ত্রণ জানালেন।

১৮৩২ সালের শেষাশেষি রামমোহন তাঁর স্বপ্নের মহাতীর্থে এসে পৌঁছুলেন।

দু-হাত বাড়িয়ে বরণ করল ফ্রান্স। তাঁর খ্যাতি সেখানে বহু আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। সাহিত্যিক, রাজনীতিক আর দার্শনিকেরা দলে দলে আসতে লাগলেন তাঁর কাছে। সোসাইটি এশিয়াটিক অফ প্যারিস তাঁকে সম্মানিত সদস্য করে নিয়ে দুর্লভ মর্যাদা দান করল। স্বয়ং লুই-ফিলিপ তাঁকে আহারে নিমন্ত্রণ করলেন।

পরম সমাদরে কয়েক মাস ফ্রান্সে কাটিয়ে রামমোহন আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন।

ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে দারুণ অর্থকষ্টে পড়লেন রামমোহন। ভারতবর্ষে এবং লণ্ডনে যে-ব্যাঙ্কটি তাঁর টাকা-পয়সা সরবরাহ করছিল, হঠাৎ সেটা ফেল পড়ল। ব্যক্তিগত জামিনে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে তিনি ঋণ চাইলেন—সে ঋণ তারা দিতে রাজী হল না। দিল্লীর বাদশাহের যে-কাজটি নিয়ে তিনি এসেছিলেন, সে-ব্যাপারেও কোম্পানি এমন কতগুলো নোংরামি করল যে, রামমোহন তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হলেন।

কেপ-টাউনে পা ভেঙে যাওয়ার পর থেকে রামমোহন কখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। টাকার অভাবে, দেনায় আর দুশ্চিন্তায় তিনি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হেয়ার পরিবার তাঁকে সানন্দে অর্থ সাহায্য করতে রাজী ছিলেন, কিন্তু বন্ধুর কাছ থেকে ঋণ নিতে তাঁর আত্মমর্যাদায় বাধল।

এই সময়ে ব্রিস্টল থেকে রামমোহনের ডাক এল। ডেকে পাঠালেন রামমোহনের গুণগ্রাহী বন্ধু রেভারেণ্ড ডক্টর কার্পেণ্টার।

ব্রিস্টলে এসে রামমোহনের অর্থকষ্ট অনেকটা দূর হল। মিস্ কিড্‌ল বলে একটি মহিলা স্টেপল্‌টন গ্রোভে তাঁর বিরাট বাড়ির অনেকখানি রামমোহনের বসবাসের জন্যে ছেড়ে দিলেন। ডক্টর কার্পেণ্টার আর তাঁর পরিবারের বন্ধুতা, মিসেস্ কিড্‌লের আতিথ্য, চারদিকের সহজ প্রীতি আর দাক্ষিণ্যের মধ্যে কিছুটা শান্তিতে রামমোহনের দিন কাটতে লাগল।

কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে আর মাথার খাটুনিতে রামমোহনের জীবনীশক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সারাজীবনের অক্লান্ত সৈনিক এবার বুঝি দেহে-মনে বিশ্রামের ডাক শুনতে পেলেন।

১৮৩৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জ্বরে পড়লেন রামমোহন। দিনের পর দিন অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগল। ডেভিড হেয়ারের ভাইঝি মিস হেয়ার আহার-নিদ্রা বন্ধ করে তাঁর সেবা করে চললেন—ডক্টর কার্পেণ্টারের মেয়ে মেরীও এগিয়ে এলেন তাঁর শুশ্রূষায়। নামজাদা ডাক্তার মিস্টার ক্যারিক এই অসাধারণ মানুষটিকে বাঁচানোর চেষ্টায় ত্রুটি করলেন না—যথাসাধ্য করলেন মিস কিডল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

অবশেষে ২৭শে সেপ্টেম্বর স্টেপলটন গ্রোভেই ভারত-পুরুষ রামমোহনের ক্লান্ত চোখে শেষ ঘুম ঘনিয়ে এল।

শোকশান্ত একটি বিষণ্ণ দিনে—স্টেপলটন গ্রোভের ছায়া-বীথির তলায় রামমোহনের শেষকৃত্য সমাধা হয়ে গেল।

দশ বছর পরে রামমোহনের বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলেতে যান, তখন তিনি রামমোহনের দেহ ওখান থেকে সরিয়ে এনে 'আরনোস ভেল' নামে আর একটি জায়গায় সমাধিস্থ করেন। —তার ওপরে গড়ে দেন চমৎকার একটি মন্দির।

আজ সে-মন্দির আমাদের জাতীয় তীর্থ।



বারো

একশো কুড়ি বছরেরও বেশি হল— রামমোহন আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন।

কিন্তু যে প্রতিভাদীপ্ত, উন্নত, ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, সে-স্বপ্ন কি আমরা সফল করতে পেরেছি? রামমোহন ছিলেন "Prophet of New India"—নব-ভারতের অগ্রদূত। তাঁর সেই নতুন ভারতবর্ষ কি গড়ে তুলতে পেরেছি আমরা?

এই প্রশ্নের উত্তরের ওপরেই নির্ভর করে আমাদের অধিকার। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী বলে পরিচয় দেবার অধিকার॥